

ব্যাংকের সুদ কি হালাল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সূচি ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুস্তাক আহমাদ কারীমী

অর্থ উৎপাদনের কাজ

ব্যাংকের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল পূর্বে জমাকৃত অর্থে বৃদ্ধিসাধন করে অর্থের সম্প্রসারণ বাড়ানো এবং অর্থভান্ডারে উন্নতি সাধন করা। একেই বলা হয় অর্থ উৎপাদন করা। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলঃ-

লোকেরা যখন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তখন নগদ (নোট) আকারে নেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করে। বরং ঋণদানের সাধারণ নিয়ম এই হয় যে, ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে এক একাউন্ট খুলে তাকে চেক বই সোপর্দ করে। যাতে প্রয়োজনমত চেক লিখে এ চেক মারফৎ টাকা প্রদান করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকার লোন নিল। ব্যাংক তাকে ১ লাখ টাকা (নগদ নোট) দেওয়ার পরিবর্তে তার নামে ১ লাখ টাকার একাউন্ট খুলে চেকই প্রদান করে। এবারে যখনই যত টাকা আদায় করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখনই সে চেক লিখে তা সহজে আদায় করতে পারবে। উপরোক্ত দুটি কথাকে সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তা করা হলে অনুমান হবে যে, ব্যাংকের নিকট যত পরিমাণ নোট মজুদ থাকে, তার চাইতে কয়েকগুণ অধিক মুনাফা লাভ করা হয়।

আর তা এইভাবে যে, যখন কোন ব্যাংকের নিকট কিছু নোট আসে, তখন সে রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ বের করে অবশিষ্ট টাকা ঋণপ্রার্থী লোকদেরকে ঋণ দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে, সে সাধারণতঃ নগদ টাকা (নোট) হিসাবে নেয়ই না, বরং একাউন্ট খুলে চেকবই নেই। পক্ষান্তরে নগদ হিসাবে নিলেও পুনরায় সে টাকা এ ব্যাংকে জমা করে দেয়। এভাবে যত টাকার অতিরিক্ত একাউন্ট খোলা হয় অর্থে ঠিক তত পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে নোট ততগুলোই থাকে, যতগুলো পূর্ব হতেই রাখা ছিল। পুনরায় ঋণগ্রহীতার একাউন্ট খোলার প্রেক্ষিতে যে নতুন ডিপোজিট ব্যাংকে স্থান পেল, তার মধ্য থেকেও রিজার্ভ বের করে বাকী টাকা ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি পুনঃ এ টাকা এ ব্যাংকেই গচ্ছিত রাখে। এর ফলে অর্থে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটে। এইভাবে অর্থে কয়েকগুণ বৃদ্ধি সাধন হয়। আর একেই বলা হয় অর্থ উৎপাদন। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যাংকে কোন এক ব্যক্তি ১০০ টাকা রাখল। ব্যাংক তা হতে ২০% অর্থাৎ ২০ টাকা রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে অবশিষ্ট ৮০ টাকা কাউকে ঋণ দিয়ে দিল। ঋণগ্রহীতাও ঋণ নেওয়ার পর এ ব্যাংকেই তা জমা রাখল। এর ফলে ব্যাংকের মোট ১৮০ টাকার ডিপোজিট হয়ে গেল। এর ২০% অর্থাৎ ৩৬ টাকা (যার মধ্যে পূর্বেই ২০ টাকা দেওয়া হয়েছে, তাই বাকী আরো ১৬ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংককে দিয়ে বাকী ৬৪ টাকা পুনরায় অন্য কাউকে ঋণ দেয়। আর সে ঋণগ্রহীতাও এ টাকা এ ব্যাংকে রাখলে তার ডিপোজিট আরো ৬৪ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ব্যাংকে ডিপোজিটের মোট অর্থ-পরিমাণ হবে ২৪৪ টাকা। পুনরায় এই অর্থের ২০% অর্থাৎ ৪৮.৮০ টাকা (যার মধ্যে ৩৬ টাকা পূর্বেই দেওয়া আছে আর বাকী ১২.৮০ টাকা) রিজার্ভ ব্যাংককে জমা করে বাকী ৫১.২০ টাকা পুনঃ অপর কাউকে ঋণ দেবে। আবার সে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি এ টাকা এ ব্যাংকেই রাখলে ব্যাংকের ডিপোজিট পরিমাণ দাঁড়াবে মোট ২৯৫.২০ টাকা।

এভাবে ব্যাংক আবারো ঋণদান করে। শেষ পর্যন্ত তার অর্থভান্ডার শূন্য থেকে যায়।

উপরোক্ত উদাহরণে ব্যাংকের মূলধন ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু এ টাকা থেকে ২৯৫ টাকার মুনাফা অর্জন করা হল। প্রত্যেক ডিপোজিটহোল্ডার নিজ নিজ ডিপোজিটের ভিত্তিতে চেক জারী করতে পারে। অর্থাৎ ২৯৫ টাকার চেক জারী হতে পারে। অথচ মূলধন ছিল মাত্র ১০০ টাকা। সুতরাং অতিরিক্ত ১৯৫ টাকা ব্যাংকের উৎপাদিত অর্থ। আর ব্যাংকের এই কাজের নাম হল ‘অর্থ উৎপাদন’।

উক্ত উদাহরণে যে কোন একটি ব্যাংককে ধরে নিয়ে বলা হয়েছে যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় এ ব্যাংকেই তা জমা রাখবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরূপও হয়ে থাকে যে, সে এ ব্যাংক ছাড়া আরো অন্য কোন ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। যার ফলে দ্বিতীয় ব্যাংকে ডিপোজিটে বৃদ্ধি সাধন হবে। সে যাই হোক; জমা যে ব্যাংকেই করুক না কেন, ব্যাংক থেকে গৃহীত প্রত্যেক ঋণের পরিণামই হল কোন না কোন ব্যাংকের ডিপোজিটে বৃদ্ধি সাধন। অতএব এ ক্ষেত্রেও সকল ব্যাংকের সমষ্টি অর্থ উৎপাদনের কর্তব্য পালন করবে।

ব্যাংকের অর্থকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আর একটি জিনিসের খুব বেশী প্রভাব আছে। যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় FLOT (ফ্লোট) বলা হয়। ব্যাংকের নিকট যে টাকা ডিপোজিট স্বরূপ থাকে তার উপর ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। এ সুদ হল ডিপোজিটের মাসুল (COST)। অর্থাৎ এত সুদ দিয়ে ব্যাংক এত ডিপোজিট অর্জন করে। কিন্তু কখনো কখনো টাকা কিছু সময়ের জন্য ব্যাংকে থাকলেও তা ডিপোজিটের পর্যায়ভুক্ত হয় না। আর তাতে ব্যাংককে সুদও দিতে হয় না। এ ধরনের টাকা ব্যাংকের এমন এক প্রকার অর্থ যার উপর কোন মাসুল বা খরচ আদায় করতে হয় না। এরূপ অবস্থা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে; যেমন, এক ব্যাংক অপর ব্যাংকের নামে চেক জারী করে। এবারে প্রথম ব্যাংক থেকে দ্বিতীয় ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর হতে কিছু সময় অবশ্যই লেগে যায়। অতএব এ সময়ের মধ্যে চেকে লিখিত এ টাকা ব্যাংকের FLOAT হয়ে যায়। এর আরো একটি উদাহরণ এরূপ; যেমন, ব্যাংক কাউকে কিছু টাকার ড্রাফ্ট দিলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ড্রাফ্ট ক্যাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ টাকা ব্যাংকের নিকট ‘ফ্লোট’ হিসাবে থাকে।

এর আরো একটি উদাহরণ যেমন, ব্যাংক কারো নামে L/C জারী করলে এল সি জারীকর্তা তখনই টাকা আদায় করে দেয়। কিন্তু ব্যাংক অপর ব্যক্তি (রফতানীকারক)-কে সেই টাকা তখনই আদায় করে, যখন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এসে পৌঁছে যায়। সুতরাং এতটা সময় ধরে বিনা কোন খরচ আদায়ে সেই টাকা ব্যাংকের নিকট (ফ্লোট হিসাবে) থাকে।

অনুরূপ রেলওয়ের বিলটি (ছোট বিল) এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র ব্যাংকে আসে। ব্যাংকে টাকা পয়সা আদায় করে কাগজাদি নেওয়া হয়। কাগজাদি নিয়ে বিলটি ছাড়ানো হয়। এবারে কাগজাদি ব্যাংক থেকে নেওয়ার সময়েই টাকা ব্যাংকে আদায় তো করে দেওয়া হয়; কিন্তু বিলটি প্রেরকের নিকট এ টাকা পৌঁছতে বিলম্ব হয়। এ বিলম্বিত সময়ের মধ্যে এ টাকাও ব্যাংকের ফ্লোট।

হজ্জের জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়। এ ছাড়া আরো অন্যান্যভাবেও ফ্লোট হয়ে থাকে। এই ফ্লোটের মাধ্যমে ব্যাংক যথেষ্ট পরিমাণের পুঁজি অর্জনে সক্ষম হয়।

এই বিস্তারিত বিবরণে আরো একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাহ্যতঃ যা বুঝা যায় তাতে মনে হয়, ব্যাংক টাকা জমাকর্তাদেরকে যত পরিমাণে সুদ দেয়, তত পরিমাণে তার খরচও হয়। যেমন ৮% সুদ দিলে তার খরচও ৮% ই হয়। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাংকের বাস্তব খরচ তার চাইতে কমই হয়; যা সে সুদের খাতে ব্যয়

করে থাকে। কারণ ব্যাংকের নিকট বহু অর্থ এমনও থাকে যার উপর কোন প্রকার সুদ আদায় করতে হয় না। উপরন্তু তার থেকে মুনাফা লাভ করা হয়। এ ধরনের অর্থ প্রথমতঃ ফ্লোটের, আর দ্বিতীয়তঃ কারেন্ট একাউন্টের। এ থেকে বুঝা গেল যে, ব্যাংক যে পরিমাণে লাভ অর্জন করে তার ৮ শতাংশ অপেক্ষা কম অংশ সাধারণ আমানতকারীদের ভাগে আসে। অতএব বলা যায় যে, ব্যাংকের লাভের উচ্ছ্বসিত গতিমুখ জনসাধারণের দিকে কম থাকে, আর ধনাঢ্য পুঁজিপতিদের দিকে থাকে বেশী। আর এইভাবে ব্যাংক সমগ্র জাতি এবং সারা দেশ বরং সারা দুনিয়ার অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। আর আপাতদৃষ্টিতে টাকা জমাকর্তাদেরকে স্বল্প সুদ দিয়ে খোশ করে দেয়; কিন্তু তলায় তলায় সমগ্র জাতির ধন-দৌলত হস্তগত করে ডাকাতের ভূমিকা পালন করে।

প্রিয় পাঠক! ব্যাংকের যাবতীয় কর্মপ্রণালী এবং কারবারের প্রকৃতি ও ধরন বিস্তারিতভাবে আপনার সামনে পেশ করা হল। আপনি আরো একবার মন দিয়ে গভীরভাবে পড়ুন। তাতে দেখবেন ও ভালোরূপে বুঝতে পারবেন যে, ব্যাংকের বুনিয়াদ ও ভিত্তিই হল সুদ। বরং সে সম্পূর্ণ সুদের উপরেই নির্ভরশীল এবং সুদী ইমারতের উপরেই তার গঠনমূলক কাঠামো কায়ম থাকে। আসুন এবারে ব্যাংক কিভাবে ও কেমন করে জাতি, দেশ এবং সারা দুনিয়ার উপর ধ্বংসের জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং সারা দুনিয়া তার সেই জালে ফেঁসে আছে তা আমরা সমীক্ষা করে দেখি।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4542>

 হাদিসবিভির প্রজেক্টে অনুদান দিন